গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৫ - ৩১ মে ২০১৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

কর্ণাটকে বিজেপির ন্যক্কারজনক ভূমিকা

বাঙ্গালোরে এসইউসিআই (সি)-র বিক্ষোভ

১৮ মে বাঙ্গালোরের মাইসোর ব্যাঙ্ক সার্কেলে কমরেড কে রাধাকৃষ্ণের নেতৃত্বে বিক্ষোভ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও কর্ণাটকে সরকার গঠন করা নিয়ে বিজেপি যে চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ করেছে তা গণতন্ত্রের উপর মারাত্মক আক্রমণ। এর প্রতিবাদে ১৮ মে এস ইউ সি আই (সি) বাঙ্গালোরে 'সেভ ডেমোক্রেসি' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখায়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বিক্ষোভ সভায় বলেন, কংগ্রেস-জেডি (এস) পর্যাপ্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের দাবি জানালেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালের পদকে অপব্যবহার করে বিজেপিকে সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান জানায়— যা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক।

তিনি আরও বলেন, গোয়া, মণিপুর এবং মেঘালয়ে একক বৃহত্তম দল হিসাবে কংগ্রেসকে সরকার গঠনের জন্য সুযোগ না দিয়ে নির্বাচন পরবর্তী জোট, যার শরিক বিজেপি—তাকে সরকার গঠনের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্ণাটকে নির্বাচনোত্তর জোট কংগ্রেস-জেডি (এস)কে সেই সুযোগ দেওয়া হল না। একই ঘটনায় একই আইনের ভিন্ন প্রয়োগ গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী এবং নির্লজ্জ ক্ষমতালালসারই উৎকট প্রকাশ। কর্ণাটক রাজ্যপালের এই অগণতান্ত্রিক ভূমিকা বিদ্যমান আইন ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এর মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকা ঘুষের মাধ্যমে এম এল এ কেনা-বেচার অনৈতিক দরজা খুলে দেওয়া হল। এর বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের প্রতিবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এটা কংগ্রেস ও জেডি(এস)-এর প্রতি সমর্থন নয়, আমরা সমবেত হয়েছি গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য ।

মনোনয়ন থেকে গণনা

বেপরোয়া সন্ত্রাস ও কারচুপির নির্লজ্জ প্রদর্শনী

পঞ্চায়েত নির্বাচন

নজিরবিহীন সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শেষ হল রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। তৃণমূল নেতারা এবার প্রথম থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলেন বিরোধীদের জিততে দেবেন না। পুলিশ-প্রশাসনকে পুরোপুরি কব্জায় নিয়ে, বিডিও-এসডিও-পুলিশ অফিসারদের নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন কীভাবে বিরোধীদের নির্বাচন থেকে একদম ছেঁটে ফেলা যায়। প্রথমেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যাতে বিরোধীরা কেউ মনোনয়নপত্রই জমা দিতে না পারে। অর্থাৎ ভোটের ময়দানে বিরোধীরা দাঁড়াতেই না পারে। তার জন্য সশস্ত্র তৃণমূল গুন্ডাবাহিনীকে দিয়ে বিডিও অফিস অবরোধ করে ফেলা, মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে তা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা, যাঁরা জমা দিয়েছেন তাঁদের ভয় দেখিয়ে, মেরে তুলে নিতে বাধ্য করা, এলাকায় প্রবল সন্ত্রাস তৈরি করে মানুষকে তটস্থ করে রাখা, বাড়িতে থান কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া, জরিমানা করা, বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া, মহিলা প্রার্থীদের শ্লীলতাহানি করা, একেকটি আসনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ছড়ানো, ভোটের দিন বুথের দখল নিয়ে অবাধে ছাপ্পা দেওয়া, ভোটকর্মীদের মারধর, এমনকী খুন করে ফেলা— সন্ত্রাস এবং রিগিংয়ের যতরকম পদ্ধতি আছে তার কোনও কিছুই বাদ দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মানুষ অনেক নির্বাচন দেখেছে, কিন্তু গণনা কেন্দ্রে দলবদ্ধভাবে ঢুকে বিরোধীদের ব্যালটে অতিরিক্ত ছাপ্পা দিয়ে নষ্ট করে শাসক দলের প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা দেখেনি। গণনায় জিতেছে অন্যজন, জয়ীর সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোচ্ছে শাসক দলের প্রার্থী। এমন অজস্র ঘটনা রাজ্য জুড়ে ঘটেছে। কোথায় প্রশাসন, কোথায় নির্বাচন কমিশন? মানুষ কার কাছে প্রতিকারের দাবি করবে? ভোটের আগেই ৩৪ শতাংশ, অর্থাৎ ২০ হাজার আসন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি হিংসা চান না, শান্তি চান। অথচ এবার ভোটপর্বে ৪০ জন মানুষের প্রাণ চলে গেল। কারা এর জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী তার জবাব দেননি। এই নির্বাচনে জনগণ কোথায়, কোথায় তাদের স্বাধীন মতামতের অধিকার? কমিশনকে শিখণ্ডী খাড়া করে শাসক দল নির্বাচনকে পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত করল।

সিপিএমের অবাম ও অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, বিশেষত সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পটভূমিতে ব্যাপক জনসমর্থন পেয়ে ২০১১ সালে সরকারে বসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচ বছর পর ২০১৬ সালে নির্বাচনেও জনসমর্থন পেয়েছে তারা। তারপর মাত্র দু'বছরেই তৃণমূল নেতৃত্বকে এই নজিরবিহীন সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে হল কেন? মুখ্যমন্ত্রী তো বারেবারেই বলেন, তাঁরা রাজ্যের নজিরবিহীন উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। তাই রাজ্যের জনগণ তাঁদের সাথেই রয়েছেন। তা হলে এই সন্ত্রাসের প্রয়োজন হল কেন? কেন তাঁরা মানুষের উপর আস্থা রাখতে পারলেন না?

এই ব্যাপক সন্ত্রাসের পিছনে বিজেপিকে মোকাবিলার তত্ত্বও একটা ডাহা বাজে কথা। বিজেপি তার বিভাজনের রাজনীতির দ্বারা কোথাও কোথাও কিছু শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেও তা যে শাসক দলের ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয় তা ফলেই প্রকাশ পেয়েছে। বিরোধী দলগুলির কারও এই মুহূর্তে তৃণমূলকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করার জন্য যে সাংগঠনিক শক্তির

চারের পাতায় দেখুন

সরকার ও তেল কোম্পানিগুলি দেশবাসীকে অবাধে লুঠ করছে

পেট্রল-ডিজেলের দামে রেকর্ড বৃদ্ধি

পেট্রল-ডিজেলের দামের ঊর্ধ্বগতি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার ভোজবাজিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু দাম বৃদ্ধি নয়, দেশবাসীকে অবাধে লুঠতরাজ। এই লুঠতরাজ চালাচ্ছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

২০ মে ডিজেলের দাম সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়ে হয়েছে ৭০.১২ টাকা, আর পেট্রল ৭৯.৯১ টাকা। গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন দাম বাড়ছে। এর পরেও প্রতিদিন দাম বাড়তেই থাকবে। এই দাম বৃদ্ধির পিছনে খাড়া করা হয়েছে বস্তাপচা দু'টি অজুহাত। প্রথমটি, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির গল্প, আর দ্বিতীয়টি, ডলারের তুলনায় টাকার দাম পড়ে যাওয়া। অথচ, ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি, যারা তেল আমদানি-নির্ভর, সেই দেশগুলিতে এখনও তেলের দাম ভারতের তুলনায় অনেক কম। ১৪ মে ২০১৮-তে যেখানে ডলারের হিসাবে (১ ডলার = ৬৮ টাকা) ডিজেলের দাম মায়ানমারে ০.৬৪, শ্রীলঙ্কায় ০.৬৯, বাংলাদেশে ০.৭৭, নেপালে ০.৮৩, পাকিস্তানে ০.৮৫ ডলার, সেখানে ভারতে তার দাম ১.০১ ডলার। আর টাকার দামে পতনের জন্য তো জনসাধারণ দায়ী নয়, তার দায় মোদি সরকারের। টাকার দামে পতনের সুফল আত্মসাৎ করছে শিল্পপতিরা রপ্তানিতে সুবিধা নিতে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশের শেয়ার বাজারে ও অন্যত্র বিনিয়োগ করতে। আর তার কুফলের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তেলের দাম বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির যে অজুহাত তোলা হচ্ছে তা একটি ধাপ্পা। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ধারাবাহিকতায় মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে বলেছিল আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ওঠাপড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদেশে তেলের দাম ওঠানামা করবে। এর গালভরা নাম দেওয়া হয়েছিল 'ট্রেড প্যারিটি প্রাইসিং মেথডলজি'। তখন এর উদ্দেশ্য ছিল তেলের জন্য আর কোনও রকম ভরতুকি না দেওয়া। কারণ, সরকারি কর্তারা তখন ধরেই নিয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়তেই থাকবে এবং তার আর্থিক দায় পুরোটাই জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতেই থাকে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের রাজ্যসভার বয়ান অনুযায়ী, ২০১৪-র যে মাসে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসেন, সেই মাসে তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১০৬.৮৫ ডলার। আর তা কমতে কমতে ২০১৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে দাঁড়ায় ২৯.৮০ ডলারে। প্রাইস প্যারিটিকে নীতি হিসাবে ধরলে যেদিন মোদি ক্ষমতায় বসেছিলেন সেদিন পেট্রলের দাম ৭১.৪১ টাকা হলে যখন তেলের দাম কমে ২৯.৮০ ডলার হয়েছিল তখন নানা রকম ট্যাক্স সহ পেট্রলের দাম হওয়া উচিত ছিল ৩০.০০ টাকার মতো। অথচ মোদি সরকার দাম বেঁধে দিল ৫৯.৯৫ টাকায়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ৬৬ শতাংশ কমলেও এদেশে দাম কমানো হল মাত্র ১৬ শতাংশ। মূল্যহ্রাসের কোনও সুফল জনসাধারণকে না দিয়ে বিপুল হারে এক্সাইজ ডিউটি ও সেন্ট্রাল ট্যাক্স বাড়িয়ে বিশাল পরিমাণে টাকা আত্মসাৎ করল সরকার। মোদি ক্ষমতায় আসার সময় পেট্রলের উপর লিটার প্রতি যে এক্সাইজ ডিউটি ছিল ৯.৪৮ টাকা, তা বাড়াতে বাড়াতে করা হল

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভোটের আগে চাকরির প্রতিশ্রুতি, ভোট পেরোলেই ভোলবদল

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৭০টি পিওন পদে চাকরির জন্য বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। ন্যূনতম যোগ্যতা অষ্টম পাশ। প্রায় ১১ হাজার আবেদন জমা পড়ে। এদের মধ্যে রয়েছেন গবেষক, বিজ্ঞানে অনার্স, বিটেক, এম টেক ডিগ্রিধারীরা। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে সরকারি অফিসে ৩৬৬টি পিওন পদের জন্য আবেদন পড়েছিল ২৩ লক্ষ। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ২৫৫ জন পি এইচ ডি, ২ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। মধ্যপ্রদেশের ৯,২৩৫ পাটোয়ারি পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল দশম শ্রেণি পাশ। কিন্তু আবেদন যাতে কম জমা পড়ে তার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা বাড়িয়ে করা হল স্নাতক। তাতেও ১২ লক্ষের উপর আবেদন জমা পড়ল যার মধ্যে ২০,০০০ পি এইচ ডি। ২০০৮-'০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ লক্ষ বেকার আর ২০১৬-'১৭ সালে এই একই পরীক্ষায় আবেদন পড়েছে দুই কোটি। সম্প্রতি রেলের একটি গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষায় আবেদন জমা পড়েছে আড়াই কোটিরও বেশি।

২০১৪-য় লোকসভা নির্বাচনের আগে বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলেছিলেন, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' কিন্তু বাস্তবের মাটিতে বিকাশের ছিঁটেফোটা প্রতিফলনও দেখা যায়নি। কোথায় উন্নয়ন? কোথায় চাকরি? চার বছরে ৮ কোটি চাকরি তো দূর অস্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী কর্মসংস্থান কমেছে ০.১ শতাংশ।

আমাদের দেশে বছরে যাদের ১৮৩ দিন কাজ মেলে তারাই শ্রমশক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। এই শ্রমশক্তির কতজন বেকার তা হিসাব করা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং, ব্যবসা, নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আই টি, পরিবহণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ এই আটটি ক্ষেত্রে ১০ জনের বেশি কাজ করে এমন সংস্থা বা কারখানা ধরে। বাকিটা যেখানে দেশের ৯০ শতাংশ লোক কাজ করে তা থাকে হিসাবের বাইরে। প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি যুবক বেকার বাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে। যাদের কাজ ছিল, তাদেরও কাজ চলে যাচ্ছে। কারণ শিল্পে মন্দা, কৃষিতে সংকট। তথ্যপ্রযুক্তিতে ইতিমধ্যে অনেকের কাজ চলে গেছে। একটি বেসরকারি সমীক্ষার মতে কিছুদিনের মধ্যে আরও ৫০ শতাংশ কাজ কমবে। ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে কোথাওই সবদিন কাজ জুটছে না, কাজ করলেও শ্রমিকরা টাকা পাচ্ছেন না। বছরের বাকি দিনগুলিতে কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। গ্রামে কর্মহীনতা ব্যাপক। ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে না গ্রাম-শহরের শ্রমজীবীরা।

কিন্তু কেন এই অবস্থা? কীভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব? সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে আন্তরিক কি? বাস্তবে আমরা দেখছি কোনও সরকারই তা চায় না। যদি চাইত তা হলে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ পদ খালি পড়ে থাকত কি? খালি পদ পূরণ তো দূরের কথা সম্প্রতি কেন্দ্র পাঁচ বছর ধরে খালি পড়ে থাকা পদগুলি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এমন একটা সময়ে যখন বেকার সমস্যা ভয়াবহ। সম্প্রতি রেলমন্ত্রী সংসদে বলেছেন রেলে ২,২২, ৫০৯ পদ খালি। সুরক্ষা দপ্তরে ১, ২৮, ৯৪২ পদ খালি। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরেই যদি এত লক্ষ পদ খালি থাকে তা হলে কেন্দ্র আর সব রাজ্য সরকারের সব দপ্তরের শূন্যপদগুলি যোগ করলে কী বিশাল আকার দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

এই শূন্যপদের সংখ্যা কত তা দেশবাসীকে জানায় না। সব পদে চাকরি তো দূরের কথা এখন তিনটি পদ শূন্য হলে একটি পদে নিয়োগ হয়। তাও ঠিকা ভিত্তিতে। ভোটের আগে যতই চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক, ভোট পেরোলেই সব শাসকের এক রা— রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তেলেভাজা বেচো— প্রধানমন্ত্রী বলেন পকোড়া।

এতেই শেষ নয়, যতটুকু সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি বের হয়, বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হয় না। এখানে কেন্দ্র হোক বা রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ বা মধ্যপ্রদেশ সব সরকারই এক। ২০১২ সালে স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা, আপার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া, ২০১৫-তে এল ডি সি, এল ডি এ, কে পি এস পদে নিয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা ২০১৮-তেও শেষ হয়নি। ৭ জুন ২০১০ বিহার সরকার বিহার কর্মচারী চয়ন আয়োগকে ২০৩০ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২-তে পরীক্ষা হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষা নিতেই লেগে গেল ২ বছর ৯ মাস। পরে কিন্তু অভিযোগের কারণে পরীক্ষা বাতিল হয়। তারপর আর পরীক্ষা নেওয়া হয়নি।

ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রের মতো বেসরকারি ক্ষেত্রেও নিয়োগ ক্রমাগত কমছে। বেসরকারি সংস্থায় চলছে অটোমেশন। অটোমেশনের মানে কর্মী ছাঁটাই, শ্রমঘণ্টা (সময়) বৃদ্ধি। কেন শ্রমিক ছাঁটাই হবে? কেন কমবে না এই শ্রম ঘণ্টা? শ্রম ঘণ্টা কমলে তো শিফট বাড়বে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। মানুষের আয় বাড়বে। বাজার সংকট কমবে। গড়ে উঠবে আরও শিল্প। আরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এ ভাবেই ভারতের বিপুল মানব সম্পদ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। অথচ যারা কাজ করে তাদের অবস্থা দুর্বিষহ। স্থায়ী শ্রমিক ক্রমাগত কমছে। সর্বত্র ঠিকা প্রথা। যে কোনও সুস্থ সভ্য সমাজে যে রক্ষাকবচগুলি প্রাথমিক বা ন্যূনতম বলে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত, এ দেশে অসংগঠিত এমনকী অনেক সময় সংগঠিত ক্ষেত্রেও সেগুলি কল্পনাবিলাস। সুরক্ষা বিধি আছে কিন্তু চতুর ঠিকাদার, মুনাফালোভী নিয়োগ কর্তা, উদাসীন সরকার শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। তাই তাদের জীবনের সুরক্ষা নেই, সামাজিক সুরক্ষাও নেই।

এই অবস্থায় মানুষের সামনে একটিই পথ খোলা আছে। তা হল চাকরির ন্যায্য দাবিতে, সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা।

জীবনাবসান

অবিভক্ত মেদিনীপুরের এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড করুণ মুখার্জী ১৯ মে সকাল দশটায় ৭০ বছর বয়সে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ফুসফুসের জটিল অসুখে ভুগছিলেন। বহু বছর ধরেই মাঝে মাঝে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত উঠত। গত কয়েক মাস কলকাতায় আমরি এবং হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালে একাদিক্রমে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানোর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

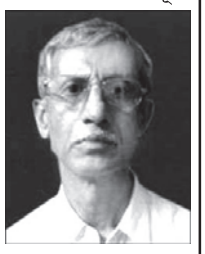

কমরেড করুণ মুখার্জীর পিতা সহ সমগ্র পরিবারটি ছিল সক্রিয় বামপন্থী পরিবার। ১৯৬৮ সালে তিনি দমদমের জেশপ কোম্পানির অ্যাপ্রেন্টিস থাকাকালীন দমদম-নাগেরবাজারের এস ইউ সি আই (সি) সংগঠক প্রয়াত কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর যোগাযোগে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কাজ শুরু করেন। তিনি দুঃস্থ অসহায় জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতিপ্রবণ, আদর্শনিষ্ঠ ও সরল ছিলেন। শারীরিক কষ্টের মধ্যেও প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কোলাঘাটের শহর ও গ্রামাঞ্চলে, এমনকী সংলগ্ন ঘাটাল মহকুমার কিছু এলাকাতে তিনি ঘুরে ঘুরে সংগঠন গড়ে তোলেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছনোর অল্প সময়ের মধ্যেই বহুসংখ্যক নেতা ও কর্মী মেছেদায় জড়ো হন। হার্ট ক্লিনিক থেকে তাঁর মরদেহ মেছেদায় দলের জেলা কার্যালয়ে আনার পরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখানে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ও রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড মানব বেরার পক্ষে কমরেড দিলীপ মাইতি সহ জেলা সম্পাদিকা ও নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী সমর্থকবৃন্দ, বিভিন্ন ক্লাব ও দোকানদার কমিটির পক্ষে পুষ্পার্ঘ্য অপর্ণ করা হয়। কমরেড মুখার্জীর ভাই কাঞ্চন ও বোন শোভাও মাল্যদান করেন এবং সকলে তাঁকে চোখের জলে লাল সেলাম জানান। তাঁর দেহ নিয়ে কয়েকশত শোকাপ্লুত সমর্থক দরদি কোলাঘাটের বাসভবন হয়ে শেষযাত্রায় অংশ নেন এবং শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ৩১ মে কোলাঘাট জৈন ভবনে বিকাল ৫টায় তাঁর স্মরণসভা।

কমরেড করুণ মুখার্জী লাল সেলাম

পেট্রল-ডিজেলের রেকর্ড দামবৃদ্ধি

একের পাতার পর

২১.৪৮ টাকা। ডিজেলে লিটার প্রতি এক্সাইজ ডিউটি ৩.৫৬ টাকা থেকে বাড়ানো হল ১৭.৩৩ টাকা: (তথ্য ঃ the times of india.indiatimes.com/business)। এর সাথে সেলস ট্যাক্স, এন্ট্রি ট্যাক্স, ভ্যাট ও পলিউশন সেস মিলিয়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ২০ থেকে ৩৭ শতাংশ ট্যাক্স আদায় করছে। তাহলে কোথায় গেল তাদের সাধের 'ট্রেড প্যারিটি প্রাইসিং মেথডলজি'? এ কি দেশের মানুষকে অবাধে লুট করা নয়?

পেট্রল-ডিজেল নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের লুটপাট, প্রতারণা ও ধাপ্পার এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা দিতে কোনও নোটিস না দিয়েই ১৯ দিনের জন্য আন্তর্জাতিক দামের সাথে প্রাইজ প্যারিটি স্থগিত করে দেওয়া হল। যেই নির্বাচন পর্ব শেষ হল, আবার প্রাইজ প্যারিটি চালু হয়ে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়ছে এবং ২০ মে তা রেকর্ড করে পেট্রল ৭৮.৯১ টাকা এবং ডিজেল ৭০.১২ টাকায় পৌঁছেছে। কিন্তু যে ১৯ দিন দাম বাড়েনি, সেই ক'দিনের জন্য কি সাধারণ মানুষ কোনও সুবিধা পেয়েছে? না, সে-গুড়েও বালি! সংবাদে প্রকাশ, 'কোটাক ইনস্টিটিউশনাল ইকুইটিজ'-এর দাবি ওই ১৯ দিন তেলের দাম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায় তেল সংস্থাগুলির গড় লাভ লিটারে ৫০-৭০ পয়সায় নেমে এসেছিল। সংস্থাগুলি সাধারণভাবে লাভ করে লিটারে ২.৭০ টাকা। এই সময়ে নাকি সংস্থাগুলির ৫০০ কোটি টাকা লাভ কম হয়েছে। এখন কোম্পানিগুলি সেই ৫০০ কোটি টাকা তুলতে চাইছে ডিজেলে সাড়ে তিন থেকে চার টাকা এবং পেট্রলে চার থেকে সাড়ে চার টাকা দাম বাড়িয়ে।

যখন ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যারেলে ১০৬.৮৫ ডলার ছিল তখন যদি পেট্রলের দাম হয় প্রতি লিটার ৭১.৪১ টাকা, তাহলে আজ সেই সময়ের চেয়ে প্রায় ২৭ ডলার কম হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ তেলের দাম ব্যারেলে ৮০ ডলারের কাছাকাছি যেতেই পেট্রলের দাম লিটার প্রতি ৮০ টাকা হয় কোন হিসাবে?

এখন সরকারি ক্ষমতায় আসীন দলগুলি এতটাই নির্লজ্জ, যখন দেশে কোনও রকম রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির ঘটনা ঘটে, জনসাধারণের দৃষ্টি সেই দিকে থাকার সুযোগে তখনই তাদের উপর তীব্র আর্থিক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, বা যে কোনও ধরনের সামাজিক অস্থিরতার সময়কেও পুঁজিপতিরা মানুষের উপর তাদের শোষণকে তীব্র করে ভোটবাজ দলগুলির কাজে লাগাচ্ছে।

দেউলিয়া রাজনীতির চেহারা দেখে তার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে অরাজনৈতিক মনোভাব, সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণে অনীহা শাসকদের আরও বেশি সুবিধা করে দিচ্ছে এই আক্রমণ শানাতে। আর সেই আক্রমণেই মানুষ আরও বেশি দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শাসক শ্রেণির দলগুলিকে সঠিকভাবে চিনতে না পেরে যেমন প্রতারিত হচ্ছে, তেমনি তা প্রতিরোধ করতে না পেরে আরও কঠিন আর্থিক আক্রমণের মুখে পড়ছে। জনসাধারণকে বুঝতে হবে যত দিন যাবে ততই এই আক্রমণ আরও বাড়তে থাকবে।

তেলের এই দামবৃদ্ধি জনজীবনের উপর মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনবে। পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়বে, গণপরিবহণের ভাড়া বাড়বে, যা সংকটজর্জরিত জনগণের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলবে। ইতিমধ্যেই এ রাজ্যে পরিবহণে ভাড়া বাড়ানোর দাবি উঠেছে। এই আক্রমণকে যে কোনও মূল্যে প্রতিহত করার জন্য জণগণকে এগিয়ে আসতে হবে। দাবি তুলতে হবে কর্পোরেটের মুনাফা কমিয়ে তেলের দাম কমাও।

ভোটারের মতামত নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতেও কাজ করছে অ্যানালিটিকা

লক্ষ লক্ষ ফেসবুক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে নির্বাচনী প্রচারে সেই তথ্য ব্যবহারের অভিযোগে সম্প্রতি কাঠগড়ায় উঠেছে ব্রিটেনের কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা নামে একটি সংস্থা। এই খবর প্রকাশ পেতেই বিশ্ব জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে ক্রমাগত বেশি বেশি মানুষ ইন্টারনেটে অনলাইন পদ্ধতিতে কেনাকাটা, ব্যাঙ্কের লেনদেন, পড়াশোনা ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এইসব কাজের প্রয়োজনে ইন্টারনেটে দিয়ে রাখা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি যাওয়া মানে একদিকে যেমন তাদের ব্যক্তিগত পরিসর বেআব্রু হয়ে পড়া, তেমনই তথ্যগুলি ব্যবহার করে যে কোনও সময় তাদের বিপদে ফেলে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়া, অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দফারফা। ফলে গোটা বিশ্বেই প্রচারমাধ্যম তথ্য চুরির এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছিল। এ খবর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যে 'অবজার্ভার' ও 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় সেখানে একটি 'স্টিং অপারেশন'-এর ঘটনা তুলে ধরা হয়। দুই সাংবাদিককে শ্রীলঙ্কার নির্বাচনের প্রার্থী সাজিয়ে ব্রিটেনের 'চ্যানেল ফোর নিউজ' চালিয়েছিল সেই অন্তর্তদন্ত। একটি ভিডিও ছবিতে প্রথম ধরা পড়ে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার সন্দেহজনক কাজকর্মের খানিকটা হালহদিশ। তথ্য ফাঁসের ঘটনা সামনে আসতেই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ব্রিটেনের দুটি সরকারি সংস্থা 'তথ্য কমিশন' ও 'নির্বাচন কমিশন' অ্যানালিটিকা এবং ফেসবুক নিয়ে তদন্ত শুরু করে। মার্কিন কংগ্রেসও তথ্য ফাঁসের তদন্ত শুরু করে এবং ফেসবুকের মালিক মার্ক জুকেরবার্গকে সাক্ষ্য দিতে ডেকে পাঠায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিছুদিন আগে হওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের যে অভিযোগ উঠেছিল, সে বিষয়ে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার কোনও ভূমিকা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা। মানুষের ক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ফেসবুক থেকে তথ্য ফাঁসের জন্য মার্ক জুকেরবার্গ জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। স্লোগান ওঠে 'ফেসবুক বাতিল কর'। এই সময় শেয়ার বাজারে ফেসবুকের শেয়ারের দাম পড়ে যায়। ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রটিতেও এই ঘটনার অভিঘাত এসে পড়ে।

অ্যানালিটিকার অনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সরব হয়েছিলেন যিনি সেই ক্রিস্টোফার ওয়াইলি এক টুইটে জানিয়েছেন ভারতের ৬০০ জেলার ৭ লক্ষ গ্রামের তথ্যভান্ডার রয়েছে এসসিএল গোষ্ঠীর কাছে। এঁর টুইট থেকে আরও জানা যায়, ২০০৯-এর লোকসভা ভোট, উত্তরপ্রদেশের ২০০৭, '১১ ও '১২ সালের ভোট, ২০১০ সালের বিহার নির্বাচন, '০৭ এর কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন, ২০০৩-এর মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের নির্বাচন ইত্যাদিতে এসসিএল-কে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী কারচুপিকে আরও নির্মম ও সূক্ষ্মতর করা হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে কী প্রহসন!

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা-ফেসবুক জুটি কীভাবে কাজ করেছে

লন্ডনের কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে 'স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনস ল্যাবরেটরি' (এসসিএল)-এর একটি শাখা রূপে কাজ শুরু করে ২০১৩ সালে। এসসিএল-এর কাজ গোটা বিশ্বে নির্বাচনগুলি পরিচালনা করা। প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের জনসমর্থন বাড়ানোর কাজে এই সংস্থার ডিজিটাল দক্ষতা ব্যবহার করত। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা তৈরির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হোয়াইট হাউস অ্যাডভাইসার স্টিভ ব্যাননের, যিনি আবার নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির অন্যতম ঘনিষ্ঠ। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ২০১৬ সালে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার অসাধু কার্যকলাপের ধরনধারণ প্রথম ফাঁস করেন ওই সংস্থারই প্রাক্তন কর্মী ক্রিস্টোফার ওয়াইলি। 'অবজার্ভার' পত্রিকায় তিনি ফাঁস করে দেন যে এই সংস্থা লক্ষ লক্ষ মার্কিন ভোটারের ফেসবুক প্রোফাইল ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি করেছে যার সাহায্যে তাদের নির্বাচনী মতামত আগে থেকে অনুমান করা যায় শুধু নয়, সেই মতকে প্রভাবিতও করা যায়। একটি অ্যাপ ব্যবহার করে ভোটারদের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হত। এই অ্যাপটি তৈরি করেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গবেষক আলেকসান্দার কোগান। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কোগানের সংস্থা গ্লোবাল সায়েন্স রিসার্চ (জিএসআর)-এর সঙ্গে একযোগে ৩ লক্ষ ৫ হাজার ফেসবুক ব্যবহারকারীকে অর্থের বিনিময়ে একটি পার্সোনালিটি টেস্ট দিতে এবং তা থেকে পাওয়া তথ্য গবেষণার কাজে লাগাবার অনুমতি দিতে রাজি করায়। কিন্তু কার্যত অ্যানালিটিকা ওই ব্যবহারকারীদের ফেসবুক-বন্ধুদের তথ্যও হাতিয়ে নেয়। তার দপ্তরে জমা হয় বিনা অনুমতিতে পাওয়া ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ফেসবুক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য। এই তথ্য থেকে ব্যবহারকারীদের মানসিকতা বুঝে, তাঁদের পছন্দ, অপছন্দ, দুর্বলতা ইত্যাদি জেনে নিয়ে নানা সোস্যাল মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে তাঁদের মতামত প্রভাবিত করা হয়। সুকৌশলে ও অত্যন্ত গোপনে এই কাজ চলে যা ব্যবহারকারীরা জানতেও পারেন না।

ব্রিটেনের চ্যানেল ফোর নিউজে প্রচারিত স্টিং অপারেশনে অংশ নেওয়া দুই সাংবাদিকের একজন কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার কাজকর্মের অনৈতিক দিকগুলি তুলে ধরেন। দেখান, নানা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন থেকে শুরু করে বানানো খবর প্রচার করা, নিজেদের মক্কেলের বিরোধী প্রার্থীকে

সাতের পাতায় দেখুন

বিজেপি নেতারা কি তাঁদের সন্তানদের টোলে পাঠাচ্ছেন বৈদিক শিক্ষা নিতে

২০১৮ সালে বসে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়ার' প্রচারক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল আবিষ্কার করেছে যত নষ্টের গোড়া নাকি আধুনিক শিক্ষা! তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর এবং তাঁর দফতরের প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিংহ সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে গিয়ে বলেছেন, আধুনিক শিক্ষা পুরোপুরি ব্যর্থ। তাই 'প্রকৃত দেশপ্রেমিক' গড়ে তুলতে তাঁরা সিলেবাসে আধুনিক শিক্ষার কিছু বিষয় বাদ দিয়ে বৈদিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। তার মধ্য দিয়েই নাকি মূল্যবোধ গড়ে তুলবেন তাঁরা!

কিন্তু কেন? এর পিছনে আছে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। সেই অনুসারেই দেশজুড়ে ছড়ানো হচ্ছে এমন ধারণা, যাতে মনে হয় আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী, মনীষী, শিল্পী, কবি সাহিত্যিকরা নতুন কিছু করেননি। যা কিছু জানার তা অতি প্রাচীন কালেই শেখা হয়ে গেছে। যেহেতু সভ্যতার কাছ থেকে মানুষের নতুন কিছু পাওয়ার নেই। তাই শোষণ-জুলুম চিরকাল চলেছে, চিরকাল চলবে একেই ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রের অনুগত দাস হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। অন্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার প্রসার ঘটিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার চর্চাকে ধ্বংস করতে এদেশের শাসকরা সবসময়েই সক্রিয় থেকেছে। বিজেপি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসার পর এই প্রচেষ্টার তীব্রতা আরও বেড়েছে।

বিজেপির চিন্তায় বৈদিক শিক্ষাই নাকি এযুগে স্বদেশপ্রেম এবং মূল্যবোধের আধার! অথচ ভারতীয় নবজাগরণের মনীষীরা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীনধারার বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই এভাবে প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে বৈদিক শিক্ষার গণ্ডিতে ছাত্রদের আটকে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছেন। নবজাগরণের ঊষাকালেই রাজা রামমোহন রায় অনুভব করেছিলেন হাজার বছরের প্রাচীন শিক্ষা নয়— ভারতীয় ছাত্রদের জন্য দরকার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধুনিক গণিতের চর্চা। লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি লিখছেন, "এ দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখার সবচেয়ে ভাল পরিকল্পিত পথ হল সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি...এই দেশে ইতিমধ্যেই দু'হাজার বছর ধরে এই শিক্ষা চলে আসছে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে পুনরায় তাই চালু করছে। যার ফলে মিথ্যা অহঙ্কার জন্মাবে। ...বেদান্ত শিক্ষার দ্বারা যুবকরা উন্নত নাগরিক হতে পারবে না।... উন্নততর ও উদার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি ও অন্যান্য কার্যকর বিজ্ঞান শিক্ষা।" রামমোহন রায়ের কি মূল্যবোধ ছিল না! এদেশের নবজাগরণের কান্ডারিরা প্রাচীন মূল্যবোধের বদলে নতুন আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দেশে আনতে চেয়েছিলেন। তাই রামমোহনকে পৌত্তলিকতা, সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। বিদ্যাসাগরকে দেশাচার, কুসংস্কাররের প্রাচীরকে আঘাত করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে মূল্যবোধের নতুন ধারণা এনে বললেন, "কোনও আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই ...আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ, কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুশি করতে দাতাকর্ণ নিজের পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন, — সতীত্বের ও আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সেকথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে" *(শেষ প্রশ্ন)*। সেই ঘৃণিত বস্তাপচা মূল্যবোধই বিজেপির হাতিয়ার হয়েছে! যখন দরকার ছিল আধুনিক যুগে এই মূল্যবোধকে আরও উন্নত জায়গায় নিয়ে যাওয়া তখন বিজেপি তাকে হাজার বছর পিছনে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কংগ্রেসও এই অপচেষ্টা স্বদেশপ্রীতির নামে করেছিল। এদেশের ছাত্রযুবকদের মূল্যবোধহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কূপমণ্ডুক প্রজন্মে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নয়কি!

বৈদিক শিক্ষা! না মিথ্যার চাষ বিজেপি-আরএসএসের! তাদের স্কুলে পড়ানো হচ্ছে বিশ্বের যে কোনও দেশের যে কোনও বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিগত আবিষ্কার সবই নাকি প্রাচীন ভারতের বেদ পুরাণ থেকে নকল করে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং ২০১৩ সালে তাঁর দল ক্ষমতায় আসার আগেই এক কর্মীসভায় বলেছিলেন, বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের আবিষ্কৃত যে নীতি অর্থাৎ ইলেকট্রনের 'আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল' মেনে আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এগিয়েছে তা ঋক বেদ থেকে ধার করা। বিজেপি-আরএসএস বলছে, বৌদ্ধ বলে আলাদা কোনও ধর্ম থাকতে পারে না, কেন না গীতা টুকেই বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত সূত্রবদ্ধ করেন এবং যীশু হিমালয়ে এসে হিন্দু সাধুদের কাছে ধর্মশিক্ষা করে খ্রিস্ট হয়েছিলেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১-১১-৯৮)। এমন অসংখ্য মিথ্যা বলে চলেছেন তাঁরা। এই মিথ্যার চাষই কি দেশপ্রেম জাগাবে?

অথচ প্রাচীন ভারতে যে একটা সময় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি হয়েছিল তা বোঝাতে মিথ্যার চাষ করার কোনও দরকারই নেই। কারণ তা বাস্তব সত্য। কিন্তু তার সিংহভাগটাই হয়েছিল বৈদিক যুগের পরে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। 'বৈদিক' নয়, লোকায়ত-চার্বাক এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবেই এই অগ্রগতি হয়েছিল। কিন্তু সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল ভারতেই এই অগ্রগতি ঘটেছিল এটা একেবারেই অনৈতিহাসিক। সারা বিশ্বের মানবজাতির এক অংশ হিসাবেই প্রকৃতিকে জয় করার তাগিদে ভারতেও নানা বিদ্যার চর্চা হয়েছে। ৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতে যখন আর্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতির ইঙ্গিত দিয়েছেন তার কিছুটা আগেই গ্রিসে এবং ব্যাবিলনে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ধারণা এসেছিল। আবার গ্রিক দার্শনিক ইরাটোস্থেনিস যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর ব্যাস মাপার কথা বলেছেন, প্রায় একই সময় সূর্য সিদ্ধান্তে অনেকটা একই ভাবে পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়ের কথা বলা হয়ছে। কিন্তু সে সময় বিশ্বের কোনও জাতির পক্ষেই পৃথিবীর বার্ষিক গতির ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তার জন্য বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে কোপারনিকাস

ছয়ের পাতায় দেখুন

বেপরোয়া সন্ত্রাস ও কারচুপির নির্লজ্জ প্রদর্শনী

একের পাতার পর

দরকার তা নেই। তা হলে এই সন্ত্রাসের কারণ কী?

আসলে এই সন্ত্রাসের কারণটি রয়েছে তৃণমূলের ভিতরেই। সিপিএমই পঞ্চায়েতকে করে খাওয়ার, অবাধ লুঠপাটের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দিয়েছিল। সিপিএম নেতারা সেদিন বলতেন, এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে যাচ্ছিস, ওরা কি তোকে চাকরি দিতে পারবে, সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে? অর্থাৎ নীতি নয়, আদর্শ নয়, যে দলে গেলে করে খাওয়া যাবে, আগের গোছানো যাবে সেই দল কর। ফলে যখনই সিপিএম ক্ষমতা হারাল দলে দলে সুযোগ সন্ধানীরা একই ধান্ধায় তৃণমূলে গিয়ে ভিড়ল। বহু জেলায় দলে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ল। পঞ্চায়েত মানেই কোটি কোটি টাকার কারবার। এই লুটপাঠের দখলদারি নিতেই এবার পঞ্চায়েতের এক-একটি আসনে একাধিক, কোথাও সাত-আটজন পর্যন্ত প্রার্থী সকলেই নিজেকে তৃণমূল পরিচয় দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নীতিহীন-আদর্শহীন এই নেতা-কর্মীরা কেউই এই লুটের দখলদারি হাতছাড়া করতে চায় না। তৃণমূল নেতৃত্বের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, একজনকে দলের প্রতীক দিলেই বাকিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে। দলে এমন নিয়ন্ত্রণ নেই যে বাকিরা নির্দ্বিধায় দলের নির্দেশ মেনে নেবে। ফলে তৃণমূল নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা ভোটই করতে দেবেন না, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতিয়ে আনবেন দলের প্রার্থীকে। সে কাজ করতে নজিরবিহীন সন্ত্রাস ছাড়া তাদের কাছে আর কোনও রাস্তাই খোলা থাকল না।

এবার শতকরা ৩৪ ভাগ আসনে ভোটই করতে দেয়নি তৃণমূল। যেগুলিতে ভোট হয়েছে সেখানেও হয়েছে ভোটের নামে প্রহসন। মানুষকে যা ভাবাচ্ছে, সিপিএম-তৃণমূলে ফারাকটা তা হলে কোথায়? সিপিএমও নির্বাচনটাকে প্রহসনে পরিণত করেছিল। নির্বাচনী কারচুপিকে 'শিল্পের' পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জেতার রেওয়াজ সিপিএমই শুরু করেছিল। যদিও সংগঠিত দল হওয়ায় সিপিএমের সন্ত্রাস-রিগিংয়ের কৌশলটা ছিল অনেক চাপা, যা শেষের দিকে প্রকাশ্যে এসে যায় এবং নির্মম রূপ নেয়। তৃণমূলের সন্ত্রাস প্রকাশ্য, কোনও রাখঢাক বিহীন। সিপিএমও পুলিশ-প্রশাসনকে এমন নির্লজ্জভাবেই কাজে লাগাত। তৃণমূল নেতারা শুরু করলেন সেখান থেকে সিপিএম যেখানে শেষ করেছিল। 'উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে' বলে তৃণমূল নেতারা যেভাবে যুব সমাজের একটা অংশকে লাঠি বাঁশ রড বোমা পিস্তল দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন, লুম্পেন হিসাবে, ঠ্যাঙাড়ে, খুনে বাহিনী হিসাবে হাতেখড়ি করিয়ে দিলেন, বেকার যুবকদের চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে ছাপ্পা দেওয়ার মতো সমাজবিরোধী কাজে লাগালেন তা এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরছে। জনপ্রিয়, সম্মানীয় ব্যক্তিদের প্রার্থী করার পরিবর্তে তৃণমূল এবার বহু আসনে দাপুটে, দুষ্কৃতী বাহিনীর পান্ডা, এমনকী কুখ্যাত সমাজবিরোধীদেরও প্রার্থী করেছে যাতে সমাজের কোনও স্তর থেকে এই লুম্পেন রাজনীতির বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দ করতে না পারে। এই ভাবে মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারকে তারা দু-পায়ে মাড়িয়েছে। কিন্তু তৃণমূল নেতারা কি মনে করেন এই ভাবেই তাঁরা ক্ষমতার দখল রাখবেন? এক সময় সিপিএম নেতারাও এমনই মনে করতেন।

একটা বিষয় মানুষকে ভাবাচ্ছে, যে সিপিএমের লক্ষ লক্ষ সদস্য আছে বলে এক সময় নেতারা গর্ব করতেন, গণসংগঠনগুলির লক্ষ লক্ষ সদস্যের কথা ঘোষণা করতেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত করতেন তাঁরা তৃণমূলের এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্যের কোথাও ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না কেন? তা হলে যতক্ষণ পিছনে সরকার আছে, পুলিশ-প্রশাসন আছে, মস্তান বাহিনী আছে ততক্ষণই তাঁরা বামপন্থী? এই কর্মীদের নিয়েই কি তাঁরা ফ্যাসিস্ট বিজেপির মোকাবিলা করবেন? দলের মধ্যে সৎ, যথার্থ বামপন্থী কর্মীদের এগুলি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, দলের কর্মীরা তো বটেই, নেতারা পর্যন্ত বিজেপিতে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন। নির্বাচনে কোথাও তৃণমূলের সঙ্গে, কোথাও বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে তুলেছেন। এ কথা তো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে যে সংগ্রামী বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (সি)-র বিরুদ্ধেও তারা এ ভাবে তৃণমূল এবং বিজেপির সাথে আঁতাত গড়ে তুলেছেন। ফলে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির পিছনে সিপিএমের ভূমিকা কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

তৃণমূলের এই সন্ত্রাসের রাজনীতিও রাজ্যের মানুষ নীরবে মেনে নেবে না। উল্লেখ করা দরকার, তৃণমূলের এই ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্যেও বহু জায়গায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সংগঠিত হয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, ছাপ্পা ভোট আটকেছেন। জনগণের কমিটি তৈরি করে তৃণমূলের প্রবল সন্ত্রাসকে রুখে দিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। অভিনন্দন সেই সব সংগ্রামী মানুষদের এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীদের যাঁরা মার খেয়ে, বোমা বন্দুক গুলির মুখে দাঁড়িয়ে এই মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, জয়ী কিংবা পরাস্ত হয়েছেন। জনস্বার্থকে সামনে রেখে এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার একমাত্র পথ।

এ রাজ্যে যাঁরা তৃণমূল কিংবা সিপিএম সম্পর্কে ক্ষোভ থেকে বিজেপির দিকে যাচ্ছেন, তাদের বুঝতে হবে, বিজেপি অন্য বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলির থেকে আলাদা কিছু নয়। সিপিএম যতদিন গণআন্দোলনে ছিল ততদিন কিছুটা হলেও সে জনস্বার্থ নিয়ে চলেছে। ক্ষমতায় বসতেই জনবিরোধী চরিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসও সামান্য অর্থে হলেও যতদিন গণআন্দোলনে ছিল ততদিন তার মধ্যে খানিকটা হলেও জনস্বার্থ, নীতিনৈতিকতা কাজ করেছে। ক্ষমতায় বসামাত্র তারও জনবিরোধী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ঠিক তেমনই বিজেপি যতদিন ক্ষমতায় আসেনি, ততদিন সে 'অন্য ধরনের পার্টি' বলে নিজের একটা ভাবমূর্তি প্রচার করেছিল। যে মুহূর্তে ক্ষমতায় বসেছে, সে মুহূর্তে অন্য শাসক বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলির মতো তারও মুখোশ খসে গিয়ে স্বরূপটা বেরিয়ে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, মহিলাদের উপর নির্যাতন, খুন-ধর্ষণ, নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, হানাহানি, দলিতদের উপর আক্রমণ, গণআন্দোলন দমন করা, কৃষক আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যা করা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মারাত্মক আকার নিয়েছে। গদির লোভ এই দলটিকে কোথায় নামাতে পারে কর্ণাটকে সরকার গড়া নিয়ে তাদের এমএলএ কেনাবেচার চেষ্টা তা দেখিয়ে দিল। এ রাজ্যে বিজেপি সভাপতির যে দাম্ভিক রূপ, কুৎসিত ভাষা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, তা যেমন কোনও ভাবেই এ রাজ্যের মানুষের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে না, তেমনই বিজেপির রাজনীতির স্বরূপটিকেও তা প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। তৃণমূলের পাল্টা যে সন্ত্রাস তারা এখনই তাদের ক্ষুদ্র সংগঠিত জায়গাগুলিতে নামিয়ে আনছে, জায়গায় জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে সতর্ক হয়ে প্রতিরোধ গড়তে হবে।

নির্বাচনের নামে গণতন্ত্রের এই হত্যা দেখে যাঁরা উদ্বিগ্ন তাঁদের এটা বুঝতে হবে, পুঁজিবাদ আজ পচে গিয়ে ফ্যাসিস্ট রূপ নিয়েছে। তার পক্ষে আজ আর গণতন্ত্র দেওয়া সম্ভব নয়। কোনও নির্বাচনই আজ আর অবাধ হবে না। যত দিন যাবে ততই তা আরও নিকৃষ্ট রূপ ধারণ করবে। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের তাঁবেদার যে দলকে ক্ষমতায় বসাতে চাইবে তার হয়ে পুলিশ-প্রশাসন-নির্বাচন কমিশন-সংবাদমাধ্যম-কর্পোরেট পুঁজি কাজ করবে। তৃণমূল বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসের কোনও একটির বদলে আর একটিকে সমর্থন করার দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে কিছুটা অর্থে হলেও রক্ষা করতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি, যা দিনে দিনে আরও মারাত্মক আকার নিচ্ছে, সেগুলি নিয়ে ব্যাপক বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, সেই আন্দোলনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত, সন্ত্রস্ত মানুষকে সামিল করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে, তৃণমূলের সন্ত্রাসকে আটকানো যাবে। একটি সত্যিকারের বামপন্থী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে এই আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে। প্রয়োজন সকলকে এগিয়ে এসে গণআন্দোলনের এই ধারাটিকে শক্তিশালী করা।

তৃতীয়বার বিজয়ী কমরেড বঙ্কিম মুর্মু

কমরেড বঙ্কিম মুর্মুকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি

মেদিনীপুর সদর ব্লকের ৭ নং বনপুরা অঞ্চলের মিচকা বুথে তৃতীয়বারের জন্য বিজয়ী হলেন গরিব মানুষের সংগ্রামী নেতা এসইউসিআই (সি) কর্মী কমরেড বঙ্কিম মুর্মু। ২০০৮-এ সিপিএম-এর লুঠেরাদের বিরুদ্ধে গরিব মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে তিনি যে লড়াই শুরু করেছিলেন তার ধারা অব্যাহত রইল। ২০১৩-তে তৃণমূল কংগ্রেস ৫০ জন গ্রামবাসীকে মেরে ভোটের আগের দিন হাসপাতালে পাঠিয়েও ভাঙতে পারেনি এসইউসিআই (সি)-র নেতৃত্বে মেহনতি মানুষের একতাকে। এবারের আক্রমণ ছিল ধারাবাহিক। ৩ জনকে কিডন্যাপ করে কেশপুরে আটকে রেখে ছিল টিএমসি। ভোটের আগের দিন গোটা গ্রামকে বিশাল ক্রিমিনাল বাহিনী ঘিরে ফেলে বোমা-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গরু-ছাগল-সাইকেল-মোটরবাইক সহ ঘরের সামগ্রী লুঠ করে গ্রামবাসীদের রক্তাক্ত করেছিল ওরা। তৎসত্ত্বেও গণআন্দোলনের আগুনে পোড় খাওয়া সংগ্রামী মানুষ বুক চিতিয়ে প্রতিরোধ গড়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এস ইউ সি আই (সি)-র নির্বাচনী ফলাফল

তৃণমূলের ব্যাপক সন্ত্রাস, রিগিং, খুন, দেদার টাকা ছড়ানোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এসইউসিআই (সি) ১০৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন পেয়েছে, সমিতিতে ৭টি আসন পেয়েছে এবং দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।

মোরাদাবাদে শিক্ষা কনভেনশন

১৩ মে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে শিক্ষা কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য দেবাশিস রায়

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় আট পৃষ্ঠায় শ্রমিক দিবসের সভার যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সভার স্থান পাটনার স্থলে মুঙ্গেরের সংগ্রামপুর হবে।

নারী নির্যাতন রোধ
শুধু আইন দিয়ে হবে না

বেড়েই চলেছে শিশু ও নারী নির্যাতন। সংবাদপত্রে চোখ রাখলে মনে হয় যেন ঘটনার স্রোত চলছে। প্রত্যেকটি ঘটনা আগেরটির থেকে আরও নৃশংস। শুধু ভয়াবহ ধর্ষণ-নির্যাতনই নয়, কোথাও ছিন্নভিন্ন উলঙ্গ নারীদেহ, কোথাও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নির্যাতিতাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটে মত্ত লম্পটের দল। দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোস্যাল মিডিয়ায়।

ক'দিন আগেই বানতলার চামড়া পট্টিতে কাজ করে ফিরছিলেন গড়িয়ার এক মহিলা। রাত ১১টায় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপরে নারকীয় অত্যাচার চালায়। প্রমাণ লোপাট করতে বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলে রেখে তাঁর উপর দিয়ে লরি চালিয়ে দেয়। অত্যন্ত দরিদ্র এই মহিলার পরিবারে বৃদ্ধ শ্বশুর ও ক্যান্সার আক্রান্ত শাশুড়ী আর অসহায় চারটি সন্তান। একমাত্র রোজগেরে এই মহিলার মৃত্যুতে পরিবারটি অথৈ জলে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় মহিলারা অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানালে পুলিশের শাসানির মুখে পড়তে হয় তাঁদের।

৪ মে গল্ফ গার্ডেনের রাস্তায় ১৫ বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আগের দিন স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। হাসপাতালের আইসিইউ-এ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এত দিন পরেও অভিযুক্তরা অধরা। পুলিশের ডিসি বলছেন, 'মেয়েটির উপর নির্যাতন হয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।' তার দেহে নাকি আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরে পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে গিয়ে ধর্ষিতা হয় সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। প্রতিবেশী 'দাদা' মেয়েটির হাত-পা-মুখ বেঁধে অত্যাচার করে, প্রকাশ করলে খুনের হুমকি দেয়।

প্রশ্ন উঠেছে, এই গরিব পরিবারগুলির যদি অর্থবল কিংবা সরকারি হোমরাচোমরাদের সাথে যোগাযোগ থাকত, তাহলে পুলিশের এই ভূমিকা দেখা যেত কি? নারী নির্যাতনকারীদের ধরতে গা নেই যে পুলিশের, মদের দোকানের সামনে লাইন ঠিক করতে তাদেরই তৎপর হতে দেখা যায়, নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায় নামলে পিটিয়ে তাদের অবরোধ ভাঙতে দেখা যায়।

গড়িয়া, গল্ফ গার্ডেন, বিষ্ণুপুরের মতো নিত্যদিনের অসংখ্য ঘটনা দেখিয়ে দেয় নারীরা আজ সমাজে কতটা নিরাপত্তাহীন, পুলিশ-প্রশাসন কতটা নিষ্ক্রিয়। দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠবে, উঠছেও।

ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা এক শ্রেণির সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রী-নেতারা নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে, সাধারণ মানুষকে অনুগত রাখতে, ভোটে জিততে দুষ্কৃতীদের ভিড় বাড়ান দলে। এদের ব্যবহার করে নরমে-গরমে আমজনতাকে দাবিয়ে রাখার কৌশল নেন নেতারা। যে দল ক্ষমতায় থাকে, দুষ্কৃতীবাহিনী পুলিশি গ্রেপ্তারি এড়াতে তারই অনুগত থাকে। বিনিময়ে নানা নেশা এবং অপকর্ম করার ঢালাও ছাড়পত্র পায় এই দুষ্কৃতীরা। ফলে, মদ ও মাদকের নেশা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। একের পর এক নৃশংস ঘটনায় শিউরে উঠে এর প্রতিকার চাইছেন সর্বস্তরের মানুষ। প্রতিবাদ হচ্ছেও দেশের সর্বত্র। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লেখালেখিও হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, শিশু এবং মহিলাদের যদি অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করা যায়, বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের যৌন সম্বন্ধজনিত পাঠ দেওয়া যায়, তাহলে এই ঘটনার নিবারণ সম্ভব। কিন্তু শুধু এই পাঠেই এইসব ঘটনা বন্ধ হবে না। এমন ঘটনা ঘটে কেন? মহিলাদের সম্পর্কে বিকৃত ধারণার অধিকারী এক অংশের 'অমানুষ' পরিকল্পিতভাবেই এই ঘটনা ঘটান। পারিবারিক বা সামাজিক বিবাদেও অন্য পক্ষকে শায়েস্তা করতে নারী নিগ্রহের 'সহজ পথ' বেছে নেওয়া হয়। মহিলাদের সচেতন থাকা না থাকার উপর তখন এমন ঘটনা ঘটা না ঘটা নির্ভর করে না।

এই নরপশুরা সমাজেরই ফসল। এদের দুষ্কর্মের মোকাবিলায় আইন-কানুনের প্রয়োগ চাই, চাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, তেমনই চাই বিকৃতকাম মানুষ সমাজে তৈরি হওয়া বন্ধ করা। এই সমাজের ঘরে ঘরে যে ছেলেরা বেড়ে উঠছে, তারা যাতে নৈতিক বোধসম্পন্ন মানুষ হয়, নোংরা সংস্কৃতির শিকার না হয়— তেমন পরিবেশ তৈরি করা জরুরি। বাস্তবে স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতার অবিরাম চর্চাই তো সুস্থ সমাজবোধ গড়ে ওঠার পথে বাধা তৈরি করছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রবল জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আমরা নারীদের নিরাপত্তা দেব। কিন্তু বিজেপির বহু নেতা নারী ও শিশু ধর্ষণে মূল অভিযুক্ত। তাদের কোনও শাস্তি হচ্ছে কি? নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অর্ডিন্যান্স এনে কেন্দ্রীয় সরকার দায় সারতে চাইছে। দিল্লিতে নির্ভয়ার মতো 'রেয়ারেস্ট অব রেয়ার ক্রাইম'-এর ঘটনা ঘটল কী করে? কাঠুয়া, উন্নাও, সুরাটের ঘটনা ঘটল কী করে? শুধু আইন করলে, অর্ডিন্যান্স জারি করলেই নারী নির্যাতনের সংখ্যা কমবে না।

লোভ-লালসা ও অপরাধপ্রবণতা এই সমাজে ক্রমাগত বাড়ছে। কোথা থেকে এর জন্ম? ধর্ষণকারী অপরাধী হয়ে কোনও শিশুই জন্মায় না। ভবিষ্যতে মানুষ হওয়ার সমস্ত উপাদান ও সম্ভাবনা নিয়েই একটি শিশু দুনিয়ার বুকে আসে। সামাজিক আদর্শ, চিন্তাধারা ও নানা প্রবণতার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চরিত্রের কাঠামো গড়ে ওঠে। আজ শিশু বয়স থেকে কী শেখানো হচ্ছে? শেখানো হচ্ছে, যে কোনও উপায়ে অর্থ উপার্জনটাই জীবনের লক্ষ্য। ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি হল জীবনের চালিকাশক্তি, ভোগই হল জীবনের সাফল্য— তা সে যত নীতিহীনই হোক।

কেন এমন শেখানো হচ্ছে? কারণ, এই নীতিহীন শিক্ষাই একচেটিয়া পুঁজির সর্বোচ্চ মুনাফার লালসাকে, দুর্নীতিকে, নির্মম শোষণকে যুক্তিসংগত এবং স্বাভাবিক বলে ভাবতে শেখায়। ভোগের হাজারো উপকরণের মধ্যে নারীদেহও অন্যতম। পণ্য বিপণনের অন্যতম হাতিয়ার বিজ্ঞাপনে নারীদেহ ব্যবহার করে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি। টিভিতে, সংবাদমাধ্যমে, সোস্যাল মিডিয়ায় খবর পরিবেশনের মাঝেই চলছে এই ধরনের কুরুচিকর প্রদর্শনী। তার সাথে চলছে মদের ঢালাও প্রসার। ফলে দুর্বৃত্তায়ন বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রবল হলে, জনমত প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলে সরকার-প্রশাসন কখনও কখনও দুর্বৃত্তদের একটা দুটো চুনোপুঁটিকে ধরপাকড় করে। তারপর ছাড়াও পেয়ে যায়। কিন্তু কেন এই দুর্বৃত্তায়ন, কোথা থেকে এর জন্ম এ প্রশ্ন না তুললে পুঁজিবাদী সমাজকে আড়াল করে রেখে একে রোখা সম্ভব নয়।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন উন্নত নতুন সমাজের পত্তন, যেখানে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠবে। উন্নত আদর্শে বলিয়ান হয়ে দেহে-মনে সুস্থ মানুষ হয়ে উঠবে। খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা, এমনকী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না। সুস্থ দেহ, সুস্থ মনের শিশুরা যে সমাজের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে, সেই স্বপ্নের সমাজই দিতে পারে শিশু ও নারীর প্রকৃত নিরাপত্তা।

কর্ণাটক ঃ কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

সদ্য সমাপ্ত কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-জেডি(এস)-এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু বিজেপিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে এমনকী আদালতের রায় অমান্য করে রাজ্যপালের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

এর তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ মে এক বিবৃতিতে বলেন, এর ফলে ব্যাপকভাবে এমএলএ কেনাবেচার সুযোগ করে দেওয়া হল। ফ্যাসিস্ট কায়দায় ক্ষমতা দখলের এই অপচেষ্টা প্রতিরোধে অবিলম্বে সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। যে দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠন করতে পারে, তাদেরই আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

পিয়ারলেস হাসপাতালে নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যু, বিক্ষোভ নার্সেস ইউনিটির

নার্সিং শিক্ষণ জুড়ে চলছে যেন এক ক্রীতদাসী প্রথা। এমনই মারাত্মক অভিযোগ তুললেন নার্সেস ইউনিটির নেতৃবৃন্দ। ১৬ মে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদিকা পার্বতী পাল বলেন, ১০ মে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের বি এস সি নার্সিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী রিংকি ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পিছনে আছে বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষের অর্থলোভ, ছাত্রীদের প্রতি চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্য এবং তাদের উপর কর্তৃপক্ষের ভয়াবহ মানসিক পীড়ন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত মৃতা ছাত্রী রিংকি ঘোষের বাবা আনন্দ ঘোষ বলেন, ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের নম্বর কম দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের পরিচালিত হাসপাতালে ছাত্রীদের অমানুষিকভাবে খাটায়। কলেজ লক্ষ লক্ষ টাকা নেয়, অথচ পরিকাঠামো নেই। অস্বাস্থ্যকর হোস্টেলে গাদাগাদি করে ছাত্রীদের থাকতে বাধ্য করা হয়। পদে পদে অপমান, মানসিক নির্যাতন প্রতিনিয়ত ছাত্রীদের বিপর্যস্ত করে দেয়। নার্সেস ইউনিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, যে নার্স রোগীর সেবা করবেন, ট্রেনিংয়ের সময় থেকেই যদি এমন অমানবিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁদের যেতে হয় — তা হলে তাঁরা ভাল নার্স হবেন কী করে?

সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে নার্সিং কলেজগুলিতে ছাত্রীদের উপর মানসিক পীড়নটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন অসুস্থ হলে পরদিন ডবল ডিউটি করতে বাধ্য করা হয় ছাত্রীদের। তার উপর অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্রীদের আরও দিশেহারা করে দিচ্ছে। পরীক্ষার ফল ৬ মাসের বেশি দেরিতে প্রকাশিত হয়— রেজাল্টের বহু আগেই পরের পাঠক্রমের পড়া অনেক এগিয়ে যায়। এরপর ছাত্রীরা যখন জানতে পারেন তাঁরা ফেল করেছেন এবং সামান্য সময়ের মধ্যেই তাদের আবার আগের পাঠক্রমে পরীক্ষা দিতে হবে— তাঁরা ট্রেনিং ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতির অপেক্ষাতেই থাকে বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা নতুন অ্যাডমিশন নিতে ছাত্রীদের বাধ্য করে। যাতে আবার কয়েক লক্ষ টাকা তারা কামাতে পারে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নার্সিং স্কুল এবং কলেজ ছাত্রীদের গণতান্ত্রিকভাবে সংসদ গঠনের অধিকার না থাকার ফলে তাঁরা প্রতিবাদের শক্তি হারিয়ে মর্মান্তিক আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। পিয়ারলেস হাসপাতালের ছাত্রীরা রিংকি ঘোষের মৃত্যুর পর আন্দোলনে নামায় কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁরা দাবি করেন, মৃতা ছাত্রীর বাবার আবেদনকে মর্যাদা দিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত, রিংকির মৃত্যুর জন্য দায়ী শিক্ষিকা ও কলেজ কর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ছাত্রীদের আন্দোলন ভাঙার জন্য দায়ের করা সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে।

নারীর মর্যাদা রক্ষার দাবিতে কনভেনশন

বীরভূমের বোলপুর শহরে মহিলাদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-গবেষক-অধ্যাপক এবং শহরের ডাক্তার-শিক্ষক সহ বিশিষ্ট জনেদের উপস্থিতিতে ২০ মে একটি নাগরিক কনভেনশন হয়। দেশের সর্বত্র শিশু ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সভায় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন নমিতা দাস। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন চৈতালি চক্রবর্তী, শিক্ষিকা যশোদা মণ্ডল, গবেষক বিউটি সাহা, বিজয় সরকার, শিক্ষক শৌনক পাল, রুদ্র কিংশুক, অধ্যাপক স্বপনকুমার বিশ্বাস, বিজয়কৃষ্ণ দলুই, সোমেশ্বর চ্যাটার্জি প্রমুখ। সভা থেকে নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে শৌনক পাল ও যশোদা মণ্ডল। যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন নমিতা দাস ও চৈতালি চক্রবর্তী।

বিজেপি নেতারা কি তাঁদের সন্তানদের টোলে পাঠাচ্ছেন বৈদিক শিক্ষা নিতে

তিনের পাতার পর

পর্যন্ত। কোনও প্রতিভাধরের পক্ষেই বাস্তব পরিবেশ, সেই বিশেষ যুগের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাকে বলে একেবারে লম্ফ দিয়ে চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কারণ তা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। আবার সারা পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার থেকে মুখ ফিরিয়ে কূপমণ্ডুক গোঁড়া তথাকথিত সনাতন হিন্দুত্বের নিগড়ে বাঁধতে গিয়েই নবম-দশম শতাব্দী থেকে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অধঃপতন ঘটেছিল। বেদান্ত এবং বেদ-অনুসারী নানা সামাজিক বিধি নিষেধের প্রভাবই ছিল তার কারণ। ভারতেই বিজ্ঞানী আর্যভট্টের পৃথিবীর আহ্নিকগতির ধারণাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্যের মতো হিন্দু জ্যোতিষিরা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "হিন্দুযুগ একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ — এই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। ...বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করার জন্যই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ ও প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি"(হিন্দু মুসলমান, কলিদাস নাগকে লিখিত পত্র)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর জন্য মূলত তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জাতিভেদ প্রথা, মনু এবং তার পরবর্তী পুরাণগুলিতে আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতিকে ধর্মীয় নিগড়ে কঠোরভাবে বেঁধে দেওয়া এবং বেদান্ত বিশেষত শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের মতো ভাববাদী দর্শনগুলির প্রভাবই এর জন্য দায়ী। সমাজপতি এবং শাস্ত্রকারদের গোঁড়ামিই যে ভারতের অধঃপতনের কারণ তা তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে তাঁর 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'তে তুলে ধরেছেন। এদেশের ছাত্রদের জন্য আধুনিক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বলছেন, 'সংস্কৃততে অঙ্ক পড়ালে চলবে না। ইংরেজিতে পড়াতে হবে।' (এডুকেশন সেক্রেটারি ময়েটকে লেখা চিঠি)। তিনি আরও বলছেন, 'সাংখ্য বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন তা আর বিবাদের বিষয় নয়' (ওই)। এমনকী স্বামী বিবেকানন্দ — যাঁর শিক্ষা বিজেপি মেনে চলে বলে প্রচার করে — তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতে সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান ও সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না?"(ভাববার কথা — স্বামী বিবেকানন্দ)। বিজেপি-আরএসএস কি এই সমস্ত মনীষীদের ভারতীয় মনে করে! ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের এই শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিতে বিজেপি-আরএসএস তৎপর। না হলে হিন্দুত্বের মিথ্যা গৌরব গাথার ধোঁয়াশার আড়ালে নরেন্দ্র মোদি বা অন্য কোনও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা নেতাকে দেশের সর্বরোগহর অবতার হিসাবে আধুনিক মন সম্পন্ন মানুষ মেনে নেবে না। বিজেপি আরএসএসদের বড় বড় নেতারা নিজেদের সন্তানদের কি টোল-চতুষ্পাঠীতে বৈদিন শিক্ষা নিতে পাঠাচ্ছেন। নাকি তাদের দেশ-বিদেশের নাম করা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে পড়াচ্ছেন? তাঁরা আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছেন —এই আধুনিক শিক্ষা মানে কেবলমাত্র কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, কিংবা মঙ্গলে রকেট পাঠানোর প্রযুক্তি নয়। আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় ভূমিকা হল আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনন তৈরি করা। যে মন শাসকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে, প্রচলিত সংস্কারের গণ্ডি ভাঙার শক্তি রাখে, তেমন মননশীলতা তৈরি করার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাই হল আধুনিক শিক্ষা। তার জন্য বস্তাপচা পুরাতন মূল্যবোধের বদলে চর্চা করা দরকার আধুনিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ। আর সেই মূল্যবোধকেই ভয় পায় বিজেপি থেকে শুরু করে সমস্ত শাসকেরা।

আধুনিক মনন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করতেই বিজেপি-আরএসএএস তাদের তীব্র বিদ্বেষমূলক হিন্দুত্ববাদী চিন্তার ছাঁচে এদেশের ছাত্র-যুবকদের ঢেলে গড়তে চাইছে। এই যুক্তিহীন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বিদ্বেষে ভরা মননই তাদের শাসনের হাতিয়ার। আরএসএস-এর গুরু গোলওয়ালকার অহিন্দু মানুষদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে হিন্দুদের পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশ বিরোধীর বদলে মুসলমান বিরোধী করতে চেয়েছিলেন, "...আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু আন্দোলনই নিছক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তার নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের ওপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে" (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড)। অর্থাৎ তাঁর মতে ক্ষুদিরাম, নেতাজি, ভগৎ সিং, চন্দ্র শেখর আজাদ মাস্টারদা সূর্য সেনথেকে শুরু করে অসংখ্য বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেউ দেশপ্রেমিক ছিলেন না। যে হিন্দু মহাসভা জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত নায়ক ডায়ারকে সমর্থন করেছিল, তাদের উত্তরসূরী বিজেপি-আরএসএস হচ্ছে 'দেশপ্রেমিক'!

এই ছাঁচে গড়া তথাকথিত 'দেশপ্রেমিক'রা এই দেশ, এই সভ্যতাকে বহু বছর পিছিয়ে নিয়ে যাবে। প্রাচীন মূল্যবোধের নাম করে মূল্যবোধহীন কিছু মানবদেহধারী যন্ত্রমানব গড়তে চায় এদেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি। তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস হিসাবে বিজেপি মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই স্তব্ধ করতে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির আমদানী করতে চাইছে। যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বহুদিন আগেই এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন,"ফ্যাসিবাদ হ'ল অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে একই সঙ্গে থাকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বিজ্ঞানের কারিগরি দিককে গ্রহণ করার কর্মসূচি এবং সমস্ত রকম অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভাববাদী ভোজবাজিকে (idealistic jugglery) শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি থেকে পরিত্রাণের সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে পরিবেশন করার চেষ্টা। এইভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি হ'ল বৈজ্ঞানিক বা সত্যনিষ্ঠ চিন্তার সাথে অলীক চিন্তার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এতে প্রকৃতি জগতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্যদিকে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণায় অলীক চিন্তাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই-এর বৈজ্ঞানিক পথ থেকে অন্ধবিশ্বাস, পূর্বধারণা ও কুসংস্কারের চোরাপথে চালিত করা এবং তার দ্বারা শেষপর্যন্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি করা"(সময়ের আহ্বান, রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড)।

আমাদের দেশের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এই আত্মসর্বস্ব, মানবিক মূল্যবোধহীন ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে শাসক শ্রেণি। এই সর্বনাশা প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসতে হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই।

অভাবের সুযোগ নিয়ে সঞ্জিতদের মৃত্যুর দিকে ঠেলছে নীতিহীন রাজনীতি

১৪ মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন নদিয়ার শান্তিপুরের বাবলা সর্দারপাড়া হাইস্কুল বুথে শাসক দলের হয়ে ছাপ্পা ভোট দিতে গিয়েছিলেন এমএ পাশ যুবক সঞ্জিত প্রামাণিক। চোখের সামনে ভোট লুট হতে দেখে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্থানীয় মানুষ। গণপ্রহারে মৃত্যু হয় তাঁর।

সদ্য পুত্রহারা, শোকে মুহ্যমান পিতার অভিযোগ, 'ছেলে বলত এমএলএ-র সঙ্গে থাকলে নাকি চাকরি দেবে। সেই আশাতেই ওদের সঙ্গে থাকত। আমরা ওকে অনেক বারণ করেছি। এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল'!

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ করেছিলেন সঞ্জিত। অভাবী পরিবার। একটা চাকরির প্রয়োজন ছিল তাঁর। কিন্তু তীব্র বেকার সমস্যার এই যুগে এমএ পাশ করেও যে এইট পাশের চাকরি জোটে না, তা অন্য অনেকের মতোই সঞ্জিতও বুঝেছিলেন। এ রাজ্যে শাসক দলের মন্ত্রী-নেতাদের ভাষণে 'কৃত্রিম উন্নয়ন' উপচে পড়লেও শিল্পায়ন নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। সামান্য যে কটা সরকারি চাকরি হয় তা নিয়ে চলে তীব্র দলবাজি। আবার শাসক দলে থাকলেই চাকরি হবে না। অতিবিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হবে। দিতে হবে আট-দশ-পনের লক্ষ টাকার সেলামি। তাঁত শ্রমিকের সন্তান সঞ্জিতের সে সামর্থ্য কোথায়! ফলে তাঁকে আনুগত্য প্রমাণের রাস্তাই নিতে হল। নির্দেশ মতো জান কবুল করে তিনি যান ছাপ্পা মারতে। তাতেই গণরোষের বলি হয়ে মৃত্যু হয় সঞ্জিতের।

এ মৃত্যুর দায় কার? শুধু কি সঞ্জিত একাই? তাঁর মতো আরও যে হাজার হাজার যুবক সন্ত্রাস কায়েম করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল — তা কীসের টানে? চাকরি-টাকা-পঞ্চায়েতি সুবিধা-লাইসেন্স পারমিট-প্রমোটারি-তোলাবাজি? না আদর্শ? খোঁজ নিলেই দেখা যাবে আর্থিক পাওনাগণ্ডা— যাকে রাজনৈতিক ভাষায় বলা হয় ঘৃণ্য-সুবিধাবাদ— তার টানেই এই সব বেকারি বিধ্বস্ত যুবকরা সন্ত্রাসী বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। সিপিএমও তার ৩৪ বছরের শাসনে এই সুবিধাবাদ দিয়েই যুবকদের দলে টানত। তাদের দিয়ে বুথ দখল করা থেকে ছাপ্পা ভোট— সবই করাতো। মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র— এ সব উন্নত আদর্শের কথা কখনও কখনও তোতা পাখির মতো তারা আওড়াতো বটে, কিন্তু এই কথাগুলির তাৎপর্য কী! তা জীবনে কী করতে বলে, কী করা থেকে বিরত থাকতে বলে! এসব বিষয় নিয়ে কোনও চর্চা এই দলের মধ্যে ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে তারা আদর্শগত ভাবে পাল্টাতে পারেনি। ফলে ২০১১ সালে নির্বাচনে হারার পরই তাদের লোকেদের তৃণমূলে বা বিজেপিতে যেতে এতটুকু আদর্শগত বাধা কাজ করেনি।

তৃণমূলও এই সুবিধাবাদের রাজনীতিই করছে। আর তা করতে গিয়ে দলের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর। বিরোধী রাজনৈতিক দল সহ এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে নির্বাচনে হারাতে সন্ত্রাস কায়েম করতে তারা নামিয়েছে রাজ্যে হাজার হাজার সঞ্জিতদের।

সঞ্জিতের মা লালী দেবীর অশ্রুভেজা চোখে ঘৃণার আগুন। পুত্র হারানোর শোক বুকে চেপে ধরে বলেছেন, 'চাকরির লোভ দেখিয়ে ওরা আমার ছেলেকে নষ্ট করেছে'। এ আক্ষেপ শুধু সঞ্জিতের মায়ের নয়। সব মায়েরই। বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যুবকদের এই গুন্ডামির পথে নামিয়ে শাসকদল তাদের মনুষ্যত্বকে হত্যা করেছে। মনুষ্যত্ব থাকলে যে তাকে দিয়ে পশুর কাজ করানো যায় না।

৯০ শতাংশ আসনে তৃণমূল জয় লুট করেছে। এ জয় অগৌরবের। লজ্জার। লজ্জা গোটা বাংলার। বাংলা কি ভারতকে সন্ত্রাসের পথ দেখাবে? নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির চর্চার মধ্য দিয়েই এই দুর্বৃত্তায়ন রুখতে হবে।

পাঠকের মতামত

শিক্ষক সমাজের কাছে আবেদন— পর্দাতোলা ভোট রুখে দিন

সর্বত্র দাবি উঠুক 'ভোটের নামে প্রহসন'-এর মতো অনৈতিক কাজে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বাধ্য করা চলবে না। এবার থেকে আগামী দিনে প্রতিটি নির্বাচনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী বাদ দিয়ে ভোটগ্রহণের জন্য চিঠি এলে ভোটের ট্রেনিং-এ একযোগে তার প্রতিবাদ করুন। যতক্ষণ না তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে ততক্ষণ কোনও ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না শিক্ষকসমাজ। শিক্ষক রাজকুমার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। বন্ধু, শিক্ষকরাই পারেন এই ফোকলা গণতন্ত্রকে কিছুটা অন্তত মেরামত করতে। আগামী দিনে মর্মান্তিক পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং ভোটে পর্দাতোলা গণতন্ত্রকে রুখে দিতে আসুন সবাই একত্রিত হই।

কিংকর অধিকারী (শিক্ষক)
বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

ভোটারের মতামত নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতেও কাজ করছে অ্যানালিটিকা

তিনের পাতার পর

আকর্ষণীয় নানা প্রস্তাব দিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তার ভিডিও রেকর্ডিং তাঁর অনুমতি ছাড়াই প্রচার করে তাঁকে হতমান করা, মহিলাদের ব্যবহার করে বিরোধী প্রার্থীদের ফাঁসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত রকম অপকৌশলে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা দক্ষ। এমনকী বিরোধী প্রার্থী যে ধর্মাবলম্বী, সেই ধর্ম সম্পর্কে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়ে তাঁর সম্পর্কে জনমানসে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতেও পিছপা নয় ওই সংস্থা। তিনি জানান, অ্যানালিটিকা নাইজেরিয়া, ভারত, আর্জেন্টিনা, চেক রিপাবলিক, কেনিয়া সহ বহু দেশে ২০০-র বেশি নির্বাচনে এই ধরনের কাজ করেছে। ব্রিটেনে অ্যানালিটিকার পিতৃপ্রতিম সংস্থা এসসিএল গোষ্ঠী কনজারভেটিভ এবং লেবার— দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের হয়েই কাজ করেছে।

সিএ-র পাশাপাশি ফেসবুকের বিরুদ্ধেও অভিযোগের ঝড় উঠেছে। কারণ ৮ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে জেনেও তাঁদের সেইসব তথ্য উদ্ধার করা ও সেগুলির নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার কোনও চেষ্টা করেনি ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। এমন অভিযোগও উঠেছে যে, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার সঙ্গে আঁতাত করেই ফেসবুক এসব তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে দিয়েছে। এমনকী কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার কাছ থেকে টাকা ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ ওঠে ফেসবুকের বিরুদ্ধে।

ভারতেও কাজ চালিয়েছে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা

ভিনদেশি প্রচারমাধ্যমে অ্যানালিটিকার অপকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ভারতেও শোরগোল ওঠে। জানা যায়, এদেশের ৩৫৫ জন ফেসবুক ব্যবহারকারী কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার পূর্বোল্লেখিত অ্যাপটি ব্যবহার করে, ফলে ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ফেসবুক ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য চলে যায় ওই সংস্থার হাতে। বিজেপি ও কংগ্রেস উভয় দল একে অপরের বিরুদ্ধে অ্যানালিটিকার পরিষেবা নেওয়ার অভিযোগ তুলতে থাকে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ফেসবুক ও অ্যানালিটিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ব্যাপক হুমকি দিতে থাকেন। যদিও বাস্তবে সেই হুঙ্কার ছিল দেশের মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার অপচেষ্টা। কারণ, এই সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সে কথা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা ভালই জানেন। অ্যানালিটিকার ওয়েবসাইটে দেওয়া এ সংক্রান্ত লেখা থেকেই তা জানা যায়। সেখানে আছে — '২০১০-এর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচনী পরিস্থিতি খুঁটিয়ে পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কেমব্রিজ অ্যানালিটিকাকে। সেখানে গত ১৫ বছরের শাসনে রাজ্যের অপরিবর্তিত দুর্দশার পরিস্থিতিতে—কোনও নির্দিষ্ট দলের গোঁড়া সমর্থক নন যাঁরা— এমন ভাসমান ভোটারদের নির্বাচন সম্পর্কে বিরূপতা কতখানি, দুই রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনে তা বুঝে নেওয়াই ছিল আসল চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্তরে স্তরে যোগাযোগ গড়ে তুলে গ্রামস্তরে মানুষের মধ্যে সমর্থন সৃষ্টি করে দলকে সংগঠিত করার। অ্যানালিটিকার টার্গেট করা মোট আসনের ৯০ শতাংশই জিতে নিয়ে আমাদের মক্কেল নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছিল।' এখানে 'মক্কেল' বলে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পষ্টতই বিজেপি, কারণ ২০১০-এর নির্বাচনে বিজেপি-জেডি(ইউ) জোটই জয়লাভ করেছিল।

ভারতে অ্যানালিটিকার পার্টনার ওভলিন বিজনেস ইন্টেলিজেন্স (ওবিআই)-এর মালিক যে অমরীশ ত্যাগী যিনি জেডি(ইউ)-এর সাধারণ সম্পাদক কে সি ত্যাগীর পুত্র— এ কথা ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসে গেছে। এই ওবিআই-এর কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রী ত্যাগী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বুথভিত্তিক গবেষণা ও নির্বাচনী ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি একটি নির্দিষ্ট বুথে কতজন ভোটার কোনও বিশেষ মতাদর্শকে সমর্থন করে ভোট দেন। ... এরপর আমরা ওই বুথের একটি নির্বাচনী চিত্র তৈরি করি' (দি এশিয়ান এজ, ২২ মার্চ, ২০১৮)। অ্যানালিটিকার ওয়েবসাইটে উল্লেখিত 'কোনও নির্দিষ্ট দলের গোঁড়া সমর্থক নন যাঁরা— এমন ভাসমান ভোটারদের নির্বাচন সম্পর্কে বিরূপতা কতখানি, দুই রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনে তা বুঝে নেওয়াই ছিল আসল চ্যালেঞ্জ'— এই বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে নিলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অনিচ্ছুক বা বিরূপ ভোটারদের মতামত প্রভাবিত করে মক্কেল দলের প্রার্থীর পক্ষে নিয়ে আসা এবং তাঁকে ভোট করানোই হল কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার উদ্দেশ্য।

অ্যানালিটিকার অনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সরব হয়েছিলেন যিনি সেই ক্রিস্টোফার ওয়াইলি এক টুইটে জানিয়েছেন ভারতের ৬০০ জেলার ৭ লক্ষ গ্রামের তথ্যভান্ডার রয়েছে এসসিএল গোষ্ঠীর কাছে। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'জনসাধারণের মধ্য থেকে বিশেষ গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে ও তাদের প্রভাবিত করে আমাদের মক্কেলদের আকাঙ্ক্ষিত ফল পেতে সাহায্য করতে আমরা পরিষেবা দিয়ে থাকি।' এক্ষেত্রে এই 'আকাঙ্ক্ষিত ফল'-এর অর্থ হল, অনৈতিক উপায়ে প্রচার চালিয়ে মক্কেল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নির্বাচনে জিততে সাহায্য করা। এঁর টুইট থেকে আরও জানা যায়, ২০০৯-এর লোকসভা ভোট, উত্তরপ্রদেশের ২০০৭, '১১ ও '১২ সালের ভোট, ২০১০ সালের বিহার নির্বাচন, ২০০৭-এর কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন, ২০০৩-এর মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের নির্বাচন ইত্যাদিতে এসসিএল-কে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী কারচুপিকে আরও নির্মম ও সূক্ষ্মতর করা হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে কী প্রহসন!

এনডিটিভি একবার রিপোর্ট করেছিল যে, 'লিঙ্কড ইন' (ইন্টারনেটে প্রাপ্ত প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক)-এ ওবিআই-এর এক বড়কর্তা হিমাংশু শর্মার পেজে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি বিজেপি-র হয়ে ৪টি নির্বাচনী প্রচার সফল ভাবে পরিচালনা করেছেন যেগুলিতে টাকার বন্যা বহানো হয়েছিল এবং ২৭২-এর বেশি আসনে জেতার লক্ষ্যে পৌঁছনো গিয়েছিল। প্রসঙ্গত, ২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি '২৭২ প্লাস' আসনে জেতার স্লোগানই তুলেছিল। বিষয়টি প্রচার হয়ে যাওয়ার পরেই শর্মার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল থেকে পেজটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

বাস্তব হল, নির্বাচনী প্রচারে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সোস্যাল মিডিয়ার ব্যাপক সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিজেপিই ছিল পথপ্রদর্শক। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ব্যাপক কার্যকরী ডিজিটাল প্রচার ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং বর্তমানে মোদি সরকারের ডিজিটাল প্রকল্প 'মাইগভ'-এর বড়কর্তা অরবিন্দ গুপ্তা টুইট করে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার ঢালাও প্রশংসা করেছেন। ফলে বিজেপির সঙ্গে এই সংস্থার ঘনিষ্ঠতা কত গভীর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আবার লন্ডনে অ্যানালিটিকার দপ্তরে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক সহ পোস্টার থাকার ঘটনাও প্রচারমাধ্যমের দৌলতে সামনে এসে গেছে।

বিজেপি এবং কংগ্রেস, পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদধন্য দুই প্রধান রাজনৈতিক দলই কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা বা তার ভারতীয় দোসরের সঙ্গে যোগাযোগের কথা অস্বীকার করে থাকে। যেটুকু তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে পরিষ্কার যে উভয় দলেরই এদের সঙ্গে ওঠাবসা রয়েছে। তবে এদেশের নির্বাচনী ক্রিয়াকলাপের কতটা গভীর পর্যন্ত অ্যানালিটিকার হাত পৌঁছেছে তা এখনও অস্পষ্ট। সংগৃহীত তথ্য কীভাবে অপব্যবহার করা যায় এবং গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে বাইরের শক্তি কেমন করে প্রভাব বিস্তার করে এই সংক্রান্ত ঘটনায় তা সামনে এসে গেল।

তথ্য নিয়ে এইসব বেআইনি কার্যকলাপে ব্যক্তির গোপনীয়তা এবং তার ব্যক্তিগত বিষয়গুলির নিরাপত্তা বিরাট প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শুধু নির্বাচনে ছাপ ফেলাই নয়, এর প্রভাব আরও বহু দূর বিস্তৃত। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে বাধ্যতামূলক ভাবে আধার নম্বর যুক্ত করার জন্য বিজেপি সরকার দেশের মানুষের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য— যেমন তার আর্থিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ, তার চলাফেরা সমস্ত কিছুই সরকারের নখদর্পণে চলে আসবে যা ভয়ঙ্কর রকম বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। প্রধানমন্ত্রীর 'নমো অ্যাপ'-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সরকারের হাতে চলে গেছে। সম্প্রতি আধারের তথ্য এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে কারণ আমাদের দেশে তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত উপযুক্ত আইন নেই। এর উপর রাজনৈতিক দলগুলির বিদেশ থেকে অর্থসাহায্য পাওয়া সহজ করে দিতে প্রচলিত আইনের যে সংশোধন করা হয়েছে তার ফলে বিদেশি অসাধু ডিজিটাল সংস্থাগুলি খুব সহজেই এ দেশের গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে নাক গলাতে পারবে।

বুর্জোয়া নির্বাচন আজ প্রহসন ছাড়া কিছু নয়

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কার্যকলাপ থেকে স্পষ্ট যে, সংকটগ্রস্ত মুমূর্ষু পুঁজিবাদের এই যুগে বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনগুলি নিছক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিকাশমান শক্তি হিসাবে পুঁজিবাদ যখন সামন্তী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল তখন তা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, জয়গান গেয়েছিল গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রের এই বুর্জোয়া ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল সংসদীয় ব্যবস্থা। ঘোষিত হয়েছিল, অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে। নির্বাচনের প্রার্থীরা নানা বিষয়ে নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করবেন। জনসাধারণ নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রার্থীদের বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার করবেন এবং যে প্রার্থী সত্যকে প্রতিফলিত করছেন, তাঁকে নির্বাচিত করবে। প্রচারমাধ্যম জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকৃত সত্য প্রচার করবে এবং শাসকদের ক্ষমতার অপব্যবহারের উপর লাগাম পরাবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংকটে নিমজ্জিত হওয়ার পর থেকেই গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। সর্বোচ্চ মুনাফা লুঠের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সহ সর্বাত্মক সংকটে পড়েছে। সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার মরিয়া চেষ্টায় বুর্জোয়া ব্যবস্থা আজ সমস্ত ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে আপস করছে। গণতন্ত্রের বুলির আড়ালে ফ্যাসিবাদ আনার অপচেষ্টা চলছে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয় অর্থের শক্তি, পেশিশক্তি আর কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত প্রচারমাধ্যমের দৌলতে জনমতকে প্রভাবিত করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান, উভয় দলের প্রার্থীর মনোনয়নের ক্ষেত্রে, কে কত বেশি টাকা ঢালতে পারবেন, খোলাখুলি তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ফেসবুক, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার মতো এই ধরনের আধুনিক সংস্থাগুলি গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সত্য খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে যুক্তিবোধ দ্বারা পরিচালিত করার চেষ্টা দূর অস্ত্, এরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করছে এবং অনৈতিক উপায়ে তাদের মতামত প্রভাবিত করছে। নিজের মক্কেল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে জেতাতে বিপক্ষ দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে যেকোনও রকম নোংরা কৌশল প্রয়োগ করতে এরা ভাড়া খাটছে। যে তাদের বেশি টাকা দেবে, তার জন্য নীতিবর্জিত কার্যকলাপে তাদের আপত্তি নেই। ফলে চরম প্রতিক্রিয়াশীল একটি রাজনৈতিক দল যদি তাদের বেশি টাকা দেয়, তাহলে তার জন্য কাজ করতে একপায়ে খাড়া থাকে এরা। এই পথেই গণতন্ত্রের প্রাণসত্তাকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

(তথ্যসূত্র ঃ প্রোলেটারিয়ান এরা, ১৫ এপ্রিল ২০১৮)

ভোটকর্মীদের নিগ্রহের প্রতিবাদে শিক্ষকদের বিক্ষোভ

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শিক্ষক সহ অন্যান্য ভোটকর্মীরা শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হাতে যেভাবে আক্রান্ত হয়েছেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। জেলাশাসকের পক্ষে ডেপুটেশন গৃহীত হয় এবং ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়। ১৮ মে গোপীবল্লভপুরেও মৌনমিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার নিন্দা এআইএআইএফ-এর

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী ১৫ মে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

আন্তর্জাতিক আইন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তীব্র নিন্দা করছে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম। ইতিপূর্বেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার যে ঘোষণা করেছিলেন, এই ঘটনায় তাতে সিলমোহর পড়ল। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৭ সালের প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক স্থান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ট্রাম্পের ওই পূর্বঘোষণা অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমালোচনার মুখে পড়েছিল এবং রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বিপুল সমর্থনে আমেরিকার বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদে সেই নিন্দাপ্রস্তাবে ভেটো দিয়েছিল আমেরিকা।

১৯৪৮ সালে ইজরায়েলের জন্মলগ্নটি চিহ্নিত হয়ে আছে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধের ঘটনায়। যার মধ্য দিয়ে ইজরায়েল বেআইনিভাবে পশ্চিম জেরুজালেমকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৯৬৭-র যুদ্ধের পর ইজরায়েল পূর্ব জেরুজালেমও দখল করে এবং ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে তথাকথিত 'ঐক্যবদ্ধ ও সম্পূর্ণ' জেরুজালেমকে নিজেদের রাজধানী ঘোষণা করে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রই জেরুজালেমের উপর ইজরায়েলের সার্বভৌমত্বকে মান্যতা দেয়নি এবং এভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙার জন্য ইজরায়েলের নিন্দা করে রাষ্ট্রসংঘে অসংখ্য প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতপুষ্ট ইজরায়েল সে সবে কান দেয়নি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ঘোষণা জেরুজালেমের আন্তর্জাতিক স্থান হিসাবে স্বীকৃতি এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্ব মেটানোর পথে বাধা সৃষ্টি করবে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের প্যালেস্টিনীয় জনগণ আমেরিকার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। জবাবে ইজরায়েল বিক্ষোভকারীদের উপর যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক ও বন্দুক নিয়ে বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে। ইতিমধ্যে গাজা সীমান্তে একদিনেই ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। কিন্তু এতে হতোদ্যম না হয়ে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে প্যালেস্টিনীয়রা সপরিবারে সামিল হয়েছেন।

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম ন্যায়সংগত দাবিতে সংগ্রামরত প্যালেস্টিনীয় জনগণের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে এবং মহিলা-শিশু সহ বিক্ষোভরত প্যালেস্টিনীয়দের উপর ইজরায়েলের বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা করছে। প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর আমেরিকা সহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মদতপুষ্ট ইজরায়েলের আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী গণ্য করা চলবে না।

মধ্যপ্রদেশে ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও গৈরিকীকরণের প্রতিবাদে ৬ মে এআইডিএসও-র ডাকে গুনা জেলা ছাত্র সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র।

কমরেড অজিত সিং পানোয়ারকে সভাপতি এবং নারায়ণ চান্ডেলকে সম্পাদক করে ৮৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

শাসকের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সন্ত্রাসবাদী

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা ১৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন, এবার ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলককে সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দিল রাজস্থানের অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বই। গত শিক্ষাবর্ষে বইটি বাজারে আসে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বইটি এক বছর ধরে পড়েছে। বইটির ২২ নং অধ্যায়ে ২২৭ পৃষ্ঠায় বাল গঙ্গাধর তিলককে বলা হয়েছে— তিনি ছিলেন 'সন্ত্রাসবাদের জনক'।

ইতিপূর্বে ভারতীয় নবজাগরণের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং প্রমুখকেও সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম যাতে মনীষীদের মহান চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে ও তাঁদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চলছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে এই ধরনের ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ বন্ধের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মীদের ধর্মঘটের ডাক

বেতন চুক্তির দাবিতে ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন (ইউএফবিইউ) ৩০-৩১ মে সারা দেশে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস জানান, তাঁদের দাবি অ্যাডহক ভিত্তিতে নয়, বেতন নির্ধারণ করতে হবে ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত ১৫তম ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সের সুপারিশের ভিত্তিতে। সেই সুপারিশে তিন ধরনের বেতনের কথা বলা হয়েছিল।

অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য নিডবেসড মিনিমাম ওয়েজ, সরকারি কর্মচারী ও পাবলিক সেক্টর ইউনিটের কর্মীদের জন্য ফেয়ার ওয়েজ এবং সকলের জন্য বাঁচার মতো মজুরি। কিন্তু এআইবিইএ এবং ইউএফবিইউ-এর মতো বড় সংগঠনগুলির নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বেতন ঠিক করার ক্ষেত্রে অ্যাডহক প্রথা চালু করেছে যা কর্মচারীদের স্বার্থ বিরোধী। এ ক্ষেত্রে কত বাড়ানো উচিত তা যথাযথভাবে বিচার না করে যা হোক একটু কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে ব্যাঙ্ক কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের থেকে অনেক কম বেতন পাচ্ছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ইউনিটি ফোরাম দাবি জানিয়েছে, তৃতীয় শ্রেণির কর্মীদের জন্য ফেয়ার ওয়েজ ৩৯,৬০০ টাকা এবং চতুর্থ শ্রেণির জন্য ফেয়ার ওয়েজ ৩৪, ৩৫০ টাকা করতে হবে। ফোরামের আরও দাবি ঠিকা নিয়োগ, আউট সোর্সিং, কর্মী সংকোচন নীতি বাতিল করতে হবে।

'উন্নয়ন' শব্দটি জনগণের কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিয়েছে

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে ২১ মে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্বে বুদ্ধিজীবী মঞ্চ যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, বাস্তবে তা একশো ভাগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মঞ্চ বলেছিল, গণতন্ত্রে বিরোধীদেরও ভূমিকা থাকে; রাজ্য শাসক দল বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসক দল বিরোধী শূন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত গড়ার কথা বলছে — তা গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে শুভ নয়।

আমাদের রাজ্যেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংবাদপত্রের সমীক্ষা অনুযায়ী শতকরা ৩৪ ভাগ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ২০ হাজার আসনে নির্বাচন হয়নি। ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ভোটার ভোট দেওয়ার সুযোগই পায়নি। নির্বাচনের মনোনয়নপর্বে ১৭ জন এবং নির্বাচনের দিন ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। বেশ কিছু পরিবার গৃহহীন হয়েছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেখা গিয়েছে অবাধে ভোট লুণ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে ভোট কীভাবে হয়েছে এবং কীভাবে গণনা হয়েছে তাও সংবাদমাধ্যম মারফত মানুষ দেখেছেন। এভাবে নির্বাচন করার দায়িত্ব কার? নির্বাচন কমিশন, শাসক দল, প্রশাসক, আমলাকুল, ছোট আদালত, বড় আদালত?— এ নিয়ে নিশ্চয়ই আগামী দিনেও আলোচনা হবে।

তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষ, যারা সকলেই দরিদ্র পরিবারের, নিহত হলেন বা গুরুতর আহত হলেন, গৃহহীন হলেন, তাদের দায়িত্ব কে নেবে? অবশ্যই এর দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারকে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ তাদেরই দিতে হবে, যদিও কোনও ক্ষতিপূরণই মৃতদের ফিরিয়ে দিতে পারে না।

গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের জন্যই প্রয়োজন মানুষের সহযোগিতা। কিন্তু বর্তমানে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর 'উন্নয়ন' শব্দটি শাসকদল ছাড়া অন্যদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর ভয়াল রূপ ধারণ করেছে, একে 'গান-পয়েন্ট' রাজনীতির সমতুল বলা চলে।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করছি এ রাজ্যের শাসকদল সহ কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে আধিপত্যবাদী মানসিকতা, দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতীদের রাজনৈতিক দলে প্রবেশ ও নেতৃত্বদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়। এই রাজ্যের নির্বাচনে সন্ত্রাস অতীতেও কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে এবং রাজনৈতিক জীবনে ছিল, গণতান্ত্রিক মানুষ এই কারণেই পালাবদল ঘটিয়েছে। বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনে যা ঘটেছে তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সকলে আশাহত হয়েছেন। সরকার ও শাসকদলের প্রতিশ্রুতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গবাসী দেশের সামনে নির্বাচনী এই চালচিত্রের জন্য লজ্জিত হচ্ছেন। অপরদিকে যে অপশক্তি জাত-পাত-ধর্মকে ভিত্তি করে দেশের সংবিধান ও তার মৌলিক রীতিনীতিগুলিকে ধ্বংস করতে চাইছে এ জাতীয় ঘটনা শুধুমাত্র তাদেরই শক্তি জোগাবে। গণতন্ত্রকামী মানুষ কখনওই এটা মেনে নিতে পারে না।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন,

বিভাস চক্রবর্তী
পবিত্র গুপ্ত
পার্থসারথি সেনগুপ্ত
ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়
তরুণকান্তি নস্কর
বিমল চ্যাটার্জী
দিলীপ চক্রবর্তী
সান্টু গুপ্ত
চন্দন সেন
মালবিকা চট্টোপাধ্যায়
প্রতুল মুখোপাধ্যায়
মীরাতুন নাহার
তরুণ মণ্ডল
অজয় চ্যাটার্জী
সুজাত ভদ্র
প্রমুখ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com